ছবি

শরদিন্দু কর

শেষ দুপুরে দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।
দরজা খুলে দিলাম। সুরেশদা। কাঁধে চামড়ার ঝোলা। জানি ওর ভেতরে দামি ক্যামেরা আছে। এরপর আমাদের অভিনয় শু হলো।
সুরেশদা বেশ জোর গলায় বললো, কৈ সন্দীপ, তোমার ছেলে কৈ?
আমার মা সাড়াশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় ঘোমটা, চোখে কৌতূহল। সুধাময়ী, ভরাট গলায় বাবা ঘরের ভিতর থেকে ডাক দেন, কে এসেছে?
আমি উত্তর দিলাম। আজ আমার পাঁচ বছরের ছেলে সুমুর জন্মদিন।
ওর তেমন ভালো ফটো হয়নি ইদানীং। বন্ধুবান্ধব তুলে দিয়েছে, তেমন পছন্দ হয়নি। ওদের ফটোতে সুমুকে অত সুন্দর দেখায় না। সুরেশদা আমাদের পাড়ার ক্যামেরাম্যান। মোড়ের মাথায় ওর ফটো তোলার দোকান। ভারী সুন্দর করে ছবি তোলেন। আরো সুন্দর করে তুলি পেন্সিল বুলিয়ে ছবিকে বড় মায়াবী করে দেন। সুরেশদাকে বলেছিলাম। আজ দুপুরে ফটো তোলার জন্যে বাড়িতে আসতে। সুমুর ফটো স্টুডিওতে গিয়েও তোলাতে পারতাম, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন।
সুরেশদাকে নিমেষে চিনতে পারলো মা, এসো সুরেশ, বৌমা কেমন আছে, তোমার বাবা?
মৃদু হেসে সুরেশদা উত্তর দিল, ভালো, তারপর কাজের কথায় এলো, সুমুকে একটু সাজিয়ে দেন মাসীমা, ওর কয়েকটা ছবি তুলবো, তার সাথে বৌমারও।
মা হেসে বললো, সে তো খুব ভালো। আমি তো সন্দীপকে বরাবর বলি, তোদের সকলকে নিয়ে তোলা একটা ছবি এখানে রেখে যা। ওরা যখন রাঁচি চলে যায় এই বড় ঘরে একলা লাগে। মাঝে মাঝে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। একটা ছবি থাকলে বরং দেখে মনটা একটু ভালো লাগবে।
সুরেশদা প্রায় সাথে সাথে বলে, আরও ভালো হয় মাসীমা আপনাদের সকলকে নিয়ে একটা ছবি তুলতে পারলে। সকলে থাকবেন।
মা একটু লজ্জায় পড়ে, না - না আমরা আবার কেন?
মায়ের চোখের দিকে তাকালাম। মায়ের বোধ হয় সেই রকমই ইচ্ছে। মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, শোন, সুরেশ কি বলছে।
কৌতুকের সুরে বাবা বললেন, কিন্তু সুরেশ, আমার যে নতুন ভালো তেমন জামা টামা নেই। কথাটা সত্যি, কিন্তু এর পিছনে কোন অভিমান নেই।
পাঁচ সাত বছর আগেও বাবা অন্য রকম ছিলেন। সব সময় পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। প্রতিদিন ভোরে দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে পরিপাটি চুল আঁচড়ে প্রায় সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে মানুষটি আমাদের শোওয়ার ঘরে দরজায় এসে বলতেন, কি রে আজ একটা মর্ণিংওয়াক হবে নাকি! চল্ ফেরার পথে সতীশের দোকানে থেকে সিঙাড়া নিয়ে আসবো। জমিয়ে চা খাওয়া যাবে।

চন্দনা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাড়া দিত, যাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়তাম।

দীর্ঘকায় মানুষটি দুটি উজ্জ্বল চোখে যেন নতুন কোন পৃথিবী দেখছেন এমনি কৌতুক - চোখে সব দেখতে দেখতে হাঁটতেন। আমি পাশে থাকতাম। অনেক গল্প হোত। সুন্দর করে কথা বলতে পারতেন বাবা।

একদিন আমার হাতে একটি লিটল ম্যাগাজিন দেখে বললেন, তুমি লেখ - টেখ নাকি? কাগজের নামটি দেখে বললেন, কি নাম, ময়ুখ? ময়ূখের প্রকৃত অর্থ জান? আমাকে বিব্রত না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, সাধারণ অর্থে কিরণ। কিন্তু আলো যখন বাঘের দাঁতে লেগে ঝকমকিয়ে ওঠে জ্যোতির নাম প্রকৃত অর্থে ময়ূখ। --- বাবা সব জিনিসের অন্তরে যেতে ভালোবাসতেন।

বাবার সব সময় পরিষ্কার জামা কাপড়, নিময় মত স্নান খাওয়া, শৰীরের যত্ন দেখে কেউ কেউ যখন বলতো -- আপনি বড় শরীরের কথা ভাবেন, বাবা হাসতেন। পরে কোন কোন দিন আমাকে বলতেন, ধূপ নেই, ফুল চন্দন নেই, নিত্য সেবা যে মন্দিরে হয় না সেখানে ঠাকুরও থাকে না। শরীরেও এক পবিত্র মন্দির। পবিত্রতা না থাকলে ঈশ্বরও থাকেন না। যদিও জানতাম বাবা কোনদিনই পুজোটুজো নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

কিন্তু কয়েক বছর হোল বাবা কোন নতুন জামা তৈরি করান নি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে তবু এক উদাসীনতা যেন সব সময় ছেয়ে আছে। সেই কৌতুক ভরা চোখে আজ নির্মল বৈরাগ্য।

পাঁচ বছর আগে পূজোর ঠিক আগেই বাবার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হোল। হার্ট অ্যাটাক। এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাবা সুস্থ হলেন। শরীর অনেক ভেঙে গেল। সেই থেকেই অন্য রকম। তবু বাবা সুস্থ হওয়ার পর চেষ্টা করেছিলেন পুরোন জীবনে ফিরে যাওয়ার। একটা দ্বন্দ্ব ছিল। মনের সঙ্গে বোঝা পড়ার ঝড় চলছিল। অন্য মানুষ যা সহজে মেনে নেয় বাবা তা নিতে পারতেন না। তবু সেই পাঁচ বছরের যুদ্ধের পর বাবা যেটুকু জয় হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ছিলেন, গত শীতের শেষে আবার একদিন শরীরের ভেতরে ভয়ঙ্কর রক্তের বিষম খেলা শু হোল। দ্বিতীয় অ্যাটাক।

আজ কয়েক দিন বাবা একটু সুস্থ। সামান্য হাঁটতে চলতে পারেন, কিন্তু পা কাঁপে।

পেঁপে গাছের নিচে চৌকি পাতা। সেখানে চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চন্দনা। পাশে ঝুমো টগরের গাছ। এক ডাল সাদা ধপধপে ফুল ফুটে আছে। আমাদের বাড়ির উঠোনে যখনই ছবি তোলা হয় এই ঝুনো টগরের ডাল আর পেঁপে গাছের নিচে সব ছবি। বড় সুন্দর জায়গা। আমার দিদিদের বিয়ের ছবি, জামাইবাবুদের নিয়ে ছবি, আমাদের বিয়ের সব ছবি এই ঝুমো টগরের গাছের নিচে। আমাদের রান্নাঘরটা পুরনো। কতবার কথা হয়েছে এই উঠোনের কোলে একটা নতুন রান্না ঘর হোক। কথাটা হয় আবার থেমে যায়। বাবা বলতেন, টগরের গাছটা তাহলে কেটে ফেলতে হয়। গাছটা আছে, নতুন রান্না ঘর আর হয়নি। এমনি ভাবেই আমাদের চলে।

কয়েক কাপ চা আর প্লেটে গরম নিমকি ভেজে নিয়ে এলো চন্দনা। চাদর পাতা চৌকিতে সে সব সাজিয়ে বললো, আসুন বাবা, আপনার চা। বাবা খুশি হলেন। বিকেলে রোদের রঙ গাঢ় হয়ে আসতে শু করলে বাবা একটু চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দেরিহলে রাগ করেন না কিন্তু সময় মত পেলে খুশি হন। সেই খুশি মুখেই বললেন, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়োনা। চৌকির কাছে নেমে এসে দ্রুত হাতে নিমকির প্লেটের দিকে হাত বাড়ালেন, আমাদের হাতে তুলে দিলেন, নিজে নিলেন না। চন্দনা বললো, বাবা, আপনি একটা অন্তত নিমকি নিন। বড় প্রসন্ন মুখে বাবা তাকালেন চন্দনার দিকে, একটা সময় আসে মা যখন শরীর আর কিছু নিতে চায়না কিন্তু মনের খিদে থেকে যায়। আমার এখন এই অবস্থা। তোমরা নাও। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, সুরেশ, তুমি কি রেডি? সুরেশদা ও আমি প্রায় একই সঙ্গে চমকে উঠলাম বাবার পরের কথায় -- তোমার মাসীমার সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলে দাওতো।

সুমুকে বেশ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে চন্দনা। নিজেও পরেছে চওড়া পাড়ের সুন্দর লাল হলুদ তাঁতের শাড়ি। বড় করে ঘোমটা দিয়ে সুমুর হাত ধরে বললো, আমরা তৈরি। সুরেশদা ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করছে। তৈরি হচ্ছে ছবি তোলার জন্যে, আমি সরে গেলাম।

আমি সরে গেলাম পেঁপে গাছের ছায়ার নিচে। পুরোন দালানের ছাদের কার্নিসের নিচে অনেকগুলি পায়রা থাকে। ভর দুপুরে পায়রা ডাকছে। পেয়ারা গাছের ডালে নির্জনতা দেখে একটা ঘুঘু বসেছিল। কু-র-কু শব্দে ডেকে উড়ে গেল এই ম

াত্র। বাতাস নেই। বড় শান্ত স্নিগ্ধ লাগছে চারপাশ -- যেন শান্তির ঢেউ। কোমল, স্বচ্ছ ও সুন্দর এই ঢেউগুলিকে ধরে র াখতে হবে। যদিও কেউই পারে না তবু সুখের এই মুহূর্তগুলি ধরে রাখতে এই আয়োজন। চারকোণা ছোট বাক্সে ধরে র াখবো এই সুখের ছবি।

হাসি হাসি মুখে চন্দনা দাঁড়িয়েছে সুমুকে সামনে নিয়ে। বড় বিস্ময় নিয়ে সুমু ক্যামেরা দেখছে। সুরেশদা সব ঠিকঠাক করে বলে উঠলো, রেডি। ক্লিক্ করে আওয়াজ হোল। ধরা হয়ে গেল সুখের ছবি।

এরপর খুব সাধারণ ভঙ্গিতে বাবাকে বললাম, এবার আপনারা বসুন তো। সুরেশদাও বলে উঠলো, মাসীমাকে নিয়ে বসুন ঐ চেয়ারে। ভালো করে একটা ক্লোজ আপ তুলে নি।

বাবা একটু তাকালেন আমার চোখের দিকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তবে তাই হোক। কোন আপত্তি করলেন না। ব াবাকিন্তু ছবি তোলাতে ভালবাসতেন না। এর আগে যখনই কোন ছবি তোলার প্রসঙ্গ এসেছে বাবা হাসতে হাসতে এড়িয়ে গেছেন। তাই এই ঝুমো টগর গাছের নিচে আমাদের সংসারের যে ছবি বছরের পর বছর নানা অনুষ্ঠানে তোলা হয়েছে, সেখানে বাবার কোন ছবি নেই। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, ক্যামেরার সামনে আমি বড় নার্ভাস ফিল করি। চোখে মুখে কেমন যেন আড়ষ্টতা আসে অথচ আমি জানি, নির্জনে অনেক সময় বলতেন, ফটোতে সব ছবি ওঠে না, যা ওঠে তার অনেক ঝাপসা হয়ে যায়। মানুষের মনই যখন সময়ের টানে স্মৃতিকে আবছা করে দেয় সেখানে ফটো কি কিছু চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে পারে? বাবার এই যুক্তি কিছুটা রহস্যময় এবং অভিমানী। তবে বাবা বড় আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, নিজের ছবি তুলতে চাইতেন না। কিন্তু অন্যের ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। সেই সব ছবির পরিচয় স্থান কাল বড় সুন্দর করে লিখে রাখতেন এ্যালবামে। আজ ভয় ছিল বাবা হয়তো ছবি তোলাতে আপত্তি করবেন।সরাসরি ফটো তোল ার কথা বললে একেবারে না করবেন। তাই সুরেশদার সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলাম সুমুর জন্মদিনের ছবি তোলার নাম করে সুরেশদাকে ডেকে এনে বাবারও একটা ছবি তুলিয়ে রাখব।

দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বাবা মা। পিছনে আমি ও চন্দনা দাঁড়িয়ে রইলাম। সুমু মায়ের কোলের কাছে। সেই ঘুঘুটা নির্জনতা দেখে আবার ঘুরে এসে বসেছে পেয়ারা গায়ের ডালে। দূর থেকে ভেসে আসা টেলিফোনের মত সুর করে ড াকছেধ কু-র-কু কু-র-কু। শুকনো পাতার মধ্যে খরবর শব্দ তুলে একটা কাঠবেড়ালী নেমে এসেছে উঠোনে। সেখানে দানা খুটে খাচ্ছে।

সুরেশদা বললেন, রেডি।

দরজার কড়া নড়ে উঠলো। আমি চোখে ইশারা করলাম, সুরেশদা কুইক্। আমার চোখের পাতা স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হোল, ক্লিক্।

দরজা খুলে দিলাম। হাসি হাসি মুখে উঠোনে পা দিলেন ডাক্তার কাকু। বাবার বন্ধু এবং আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। হাতে সেই পরিচিত বাক্স নেই, শার্ট প্যান্টও পরেন নি। ধুতি পাঞ্জাবি আর ডাক্তারের নির্লিপ্ত মুখের বদলে বড় সাধারণ নরম মুখ। চারপাশে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, কি ব্যাপার ফটো তোলা হবে বুঝি খুব ভালো। আমারও একটা ভ ালো খবর আছে নরেন। মেয়ের বিয়ে।

হলুদ লাগানো সাদা একটা খাম আগিয়ে দিলেন বাবার হাতে। বাবা ডাক্তারকাকুর হাত ধরে বললেন, ভারি সুখবর, বে াস।

চন্দনা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, একটু বসুন কাকাবাবু চা নিয়ে আসছি। ডাক্তারকাকু বাধা দিলেন, আজ থাক মা বড় ব্যস্ত। এত নিমন্ত্রণের কার্ড, সব বাড়িতে যাওয়া আছে।

মা বললেন, তা কি হয়, আজ মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছাড়বো। আজ আমাদের সুমুর জন্মদিন। বাবা খুশিতে মাথা নাড়লেন, চা হোক চা।

সন্ধ্যাবেলা আকাশে চাঁদ উঠলো রূপোর থালার মত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নাময় মায়াময় অন্ধকার জমেছিল ঝুমো টগরের ড ালের নিচে, পেঁপে গাছের ছায়ায়। পুরোন দালানের টবে চন্দ্রমল্লিকার বুকে আছড়ে পড়ছে চাঁদের দুধ। চুপচাপ বসেছিল াম উঠোনে।

দীপু, ভরাট শান্ত গলায় বাবা ডাকলেন। উঠতে যাবো, কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমাকে বোধ হয় তোরা আর ধরে র

াখতে পারবি না।
না, না, মৃদু হেসে প্রতিবাদ করে উঠলাম।
তোরা বুঝে গেছিস আমি আর থাকবো না। তাই না?
বাবা হাসলেন। বুঝলাম ছলনা করা বৃথা। কাছে গিয়ে হাত ধরলাম। সেই রহস্যময় মুখে বাবা বললেন, আজ দুপুরে ঘুঘু ডাকছিল, বড় সুন্দর রোদমাখানো দুপুর, তোর মা হাসছিল, বৌমা চা নিমকি করে খাওয়াল। তোর ফটোতে এর সব কিছুই উঠলো না। একদিন তুই যখন আমার ছবি দেখবি আমি যখন থাকবো না তখন কি এই দুপুরের সব ছবি তোর মনে পড়বে?
বাবা, আমি অপরাধীর স্বরে বললাম, আমি কি কিছু ভুল করেছি? যদি করে থাকি ক্ষমা করবেন। আমি কিন্তু ---
আমাকে থামিয়ে মাথায় একটি হাত রেখে সুন্দর মৃদু স্বরে বাবা বললেন, আমাকে মনে রাখবি তো দীপূ?

জগন্নাথপুর মন্দিরের নিচে পাথরে দাঁড়িয়ে আছি। পিছনে ক্লান্ত হলুদ সূর্য। দূরে দেখতে পাচ্ছি কলোনির কোয়াটার্সগুলি শেষ বিকালের আলোয় বড় অপরূপ হয়ে আছে। দূরে সবুজ পাহাড়। চূড়োর ওপরে সাদা মন্দির। দূর থেকে ভেসে আসছে ঘন্টাধবনি।
মা, তুমি বাপির পাশে দাঁড়াও তো।
চন্দনা একটু লজ্জা পেল, কিন্তু সুমুর কথার অবাধ্য হোল না। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।
ক্যামেরা হাতে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় সুমু বললো, রেডি।
আমি কিন্তু বার বছর আগেকার সেই সুরেশদার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।
আমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো। মৃত্যু চিন্তা নেই। তবু সারা শরীরের এক অচেনা স্রোত বয়ে যায়।
সব কিছু ভুলে মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠলাম, রেডি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com